উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে:

এসএসএস

কারিগরি সহায়তায়:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

আর্থিক সহযোগিতায়:

IFAD
Investing in rural people

এসএসএস ও প্রকল্প পরিচিতি

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) জাতীয়-পর্যায়ের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৮৬ সালে সমদর্শনে আবদ্ধ কিছুসংখ্যক উদ্যমী ব্যক্তির নির্মোহ প্রচেষ্টায় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি ও কল্যাণ ঐতিহ্যে আগুয়ান এ-সংস্থাটি বর্তমানে উন্নয়ন ও জনবান্ধব বহুমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে--কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও সংস্করণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরাপদ খাদ্য-পুষ্টি উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পিছিয়েপড়া জনতার ক্ষমতায়নে সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত।

উদ্যোক্তা-পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল-চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ *সংস্থার একটি বিশেষ কার্যক্রম। এসএসএস জুলাই ২০১৭ পেস প্রকল্পের একটি উপপ্রকল্প হিসেবে এই কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমটি পিকেএসএফ-এর কারিগরি সহায়তায় এবং ইফাদের অর্থায়নে সংস্থার টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার চারাবাড়ী ও দাইন্যা শাখায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।*

ফলচাষ ও কৃষিজ অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি। জিডিপির ১৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে আর শ্রমশক্তির ৪০.৬০ শতাংশ নিয়োজিত এ-খাতে। মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.০৫ হেক্টর। বাংলাদেশের শস্য নিবিড়তা মাত্র ১৯৭ শতাংশ। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে দেশি জাতের কোন-না-কোন ফল উৎপাদিত হয়। বর্তমানে দেশের কোথাও কোথাও বাণিজ্যিকভাবে ফলচাষ শুরু হয়েছে। ফল চাষের জমি মাত্র ২.৮০% এবং দেশি ফল জাতীয় পর্যায়ের চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ পরিপূরণ করে। ক্রেতা সাধারণের চাহিদা ও নগদ অর্থের দিক বিবেচনায় দেশে ইদানিং বিদেশি জাতের রকমারি ফলচাষ শুরু করা হয়েছে। ড্রাগন ফল এরমধ্যে অন্যতম। লক্ষ্য করা গেছে, বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটি এ-ফল চাষের উপযোগী।

ড্রাগন ফলের আদিবৃত্তান্ত

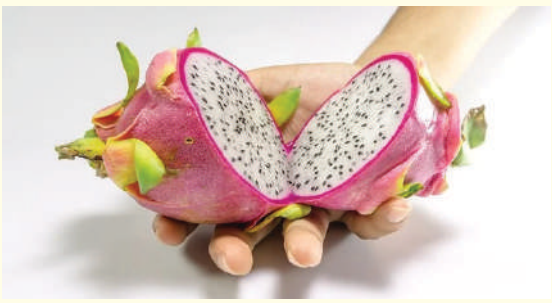

ইংরেজী ডিকশনারিতে ড্রাগন ফলকে পিটাহায়া বা পিটায়া নামকরণ করা হয়েছে। ড্রাগন ফল সাধারণত টক (Stenocerous) ও মিষ্টি (Hylocerous) দুই জাতের হয়ে থাকে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মিষ্টি ড্রাগন ফলই বাণিজ্যিকভাবে চাষা হয়ে থাকে। এই ফল পুষ্টি ও ঔষধি গুণে অতুলনীয়। এটি মূলত হাযলোসিরিয়াস পর্বের (Hzlocereus) ফণীমনসা (Cactus) প্রজাতির উদ্ভিদ। ড্রাগন ফলের গাছ চিরসবুজ ও পাতাবিহীন। এই ফলের রং একাধিক, তবে সাদা, গোলাপী ও লাল রঙের ফল-ই বেশি দেখা যায়। ফলের আকার ডিম্বাকৃতি। প্রতিটি ফলের ওজন ২০০ গ্রাম থেকে ১.২ কেজি পর্যন্ত হয়। ফলের ভিতর কালোজিরার মতো অসংখ্য বীজ থাকে। এর জন্ম সেন্ট্রাল আমেরিকায়, বর্তমানে এশিয়ার দেশসমূহে যেমন: থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইসরাইল, মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় এই ফল খুবই প্রসিদ্ধ ও বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে। বিশেষ করে ভিয়েতনামে এই ফলটি বাণিজ্যিকভাবে প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হচ্ছে।

উৎপাদনশীলতা

ড্রাগন ফল হলো ক্যাকটাস জাতীয় দ্রুতবর্ধনশীল বহুবর্ষজীবী গাছ। এগাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃতকরণের জন্য (ভাটিক্যাল পোল) খুঁটির প্রয়োজন হয়। বাগান স্থাপনে প্রাথমিক অবস্থায় জমি প্রস্তুত, চারা রোপণ এবং পরিচর্যার জন্য এককালীন বিনিয়োগের দরকার হয়। উল্লেখ্য যে, চারা রোপণের তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের টাকা ওসুল করা যায়। আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক নার্সারিতে এই ফলের চারা পাওয়া যায়। বছরে প্রায় সাত মাস ফল পাওয়া যায়, যা সাধারণত মে হতে নভেম্বর মাসে আরহণ করতে হয়। গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, রোপণের প্রথম তিন বছর প্রতিটি খুঁটি হতে গড়ে ৩-৪ কেজি (প্রতি বিঘা হতে ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি) ফল পাওয়া যায়। গাছের বয়স ০৩ বছরের বেশি হলে প্রতিটি খুঁটি হতে গড়ে ১০ থেকে ১২ কেজি (প্রতি বিঘা হতে ১.৫ থেকে ২.০০ টন) ফল উৎপাদন করা যায়। এই ফল রোপণের জন্য সাধারণত এঁটেল-দোআঁশ মাটির প্রয়োজন হয়। তবে বৃষ্টির পানি না-জমে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। জমিতে অধিক পরিমাণ সেচ, অতিবৃষ্টি ফল উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি করে। এর ফলে গাছে ফুল ফুটতে পারে না, অন্যদিকে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে। ড্রাগন গাছের ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জনিত রোগ হয়ে থাকে। এগুলো Good Agricultural Practice-এর মাধ্যমে নিরাময় করা সম্ভব। এছাড়াও এফলের বাগান পশুপাখির উপদ্রব হতে রক্ষার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এ-ফলটি মূলত ফ্রেশফ্রুট হিসেবে খাওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পণ্য যেমন--জ্যাম/জেলি, আইসক্রিম, ফ্রুট জুস এমনকি ফেসপ্যাক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। গবেষণায় দেখা যায়, ড্রাগন ফলের বাগানে নাইট লাইটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করলে অধিক ফল পাওয়া যায়। নাইট লাইটিং হলো: রাতের বেলায় নির্ধারিত পরিমাণ আলো জ্বালিয়ে বৃক্ষেরবর্ধন, ফুল এবং ফল উৎপাদন ত্বরান্বিতকরণ প্রক্রিয়া। একে (Photomorfogenesis) ফটোমরফোজেনেসিস বলে, যা ফটোসিনথেসিস (Potosynthesis) হতে ভিন্নতর। প্রক্রিয়া *(তথ্য: আয়ন আশডন, ২০১৬; Relevance in Illumination Engineering).*

বাংলাদেশে ড্রাগন ফল চাষ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাউ জার্ম প্লাজম সেন্টার ২০০৭ সালে ড্রাগন চাষের ওপর প্রথম কাজ শুরু করে। বাউ জার্ম প্লাজম সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ড. এম. এ রহিম থাইল্যান্ড, ফ্লোরিডা ও ভিয়েতনাম থেকে ড্রাগন ফলের বিভিন্ন জাত সংগ্রহ করেন। প্রয়োজনীয় গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ শেষে ২০০৯ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাটোরের বড়াইগ্রামে হবিদুল ইসলামের বাড়িতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রাগন ফলের চাষ উদ্বোধন করেন। মাত্র আড়াই বছরের পরিচর্যায় সেখানে আশানুরূপ ফল লক্ষ্য করা যায়। এরপর বাউ জার্ম প্লাজম সেন্টার নাটোর, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটিসহ বেশকিছু অঞ্চলে ড্রাগন ফলের চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

টাঙ্গাইলে এসএসএস-এর উদ্যোগে ড্রাগন ফলচাষ

এসএসএস জুলাই ২০১৭ সালে উদ্যোক্তা-পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম PACE (Promoting Agricultural Commercialization and Enterprise) প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। উপ-প্রকল্পটি ইফাদ ও পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এসএসএস বাস্তবায়ন করেছে। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চারাবাড়ী ও দাইন্যা শাখার মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ২০ জন উদ্যোক্তাকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৫ জন পুরুষ এবং পাঁচজন নারী। উদ্যোক্তাদেরকে এই উপ-প্রকল্প হতে আর্থিক ও কারিগরি-সহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ মৌসুমে সদস্যদের বাগানে ফলন শুরু হয়েছে। ২০২০ সালে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পুষ্টি মূল্য ও ঔষধি গুণ

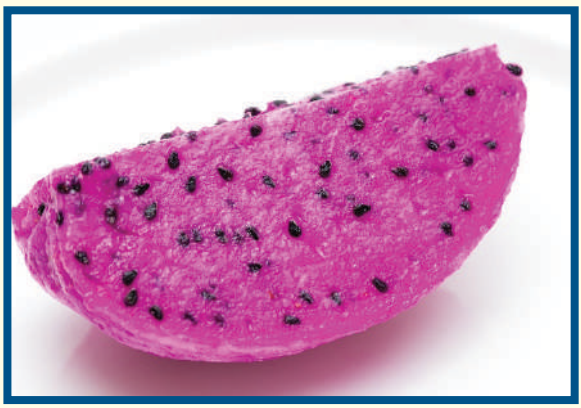

ড্রাগন পুষ্টি ও ঔষধি গুণে ভরপুর একটি ফল। এটি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল, ফাইটো অ্যালবুমিন, অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্ট এবং উচ্চ-মাত্রার ফাইবারে সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে পানি ৮২-৮৩ গ্রাম, ফাইবার রয়েছে ০.৭০-০.৯০ গ্রাম, ফ্যাট ০.২১-০.৬১ গ্রাম, বিটা ক্যারোটিন ১২.০৬ মাইক্রো গ্রাম, ফসফরাস ৩০.২০-৩৬.১০ মিলি গ্রাম, আয়রন ০.৫৫-০.৬৬ মিলি গ্রাম, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ২২.৫ মিলি গ্রাম, প্রোটিন ০.১৬-০.২৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬.৩০-৮.৮০ মিলি গ্রাম। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় রিবোফ্লাভিন ০.০৪৩-০.০৪৪ মি.গ্রাম, থায়ামিন ০.২৮-০.৩০ মিলি গ্রাম, ও নায়াসিন ০.১৬ মি. গ্রাম। *(তথ্য: এভিনোয়াম নার্ড ও ইউসেফ মিজরাহী, ২০১৩; J.Amer.Soc.Hort.Soci, ১২৩(৪):৫৬০-৫৬২,১৯৯৮) ও ড্রাগন ফ্রুট কালটিভেশন ইন শ্রীলঙ্কা)।*

ড্রাগন ফল চোখের সুস্থতা ও হজম শক্তি বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকরী। এটি মানব শরীরে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত ড্রাগন ফল খেলে শরীরের চর্বি হ্রাস পায়, মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে। হাড় শক্ত হয়, দাঁত সুস্থ রাখে। রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, শরীরের কাটা ও ভাঙা জোড়া লাগাতে সাহায্য করে, ত্বক মসৃণ রাখে। দীর্ঘমেয়াদি আন্ত্রিক সমস্যার সমাধান করে। লিভারকে সক্রিয় ও সুস্থ রাখে। *[তথ্যসূত্র: সোনাওয়েন, মাধুরি শ্রীকান্ত (২০১৭), ড্রাগনের পুষ্টি ও ঔষধি গুণ, এশিয়ান জার্নাল ফর হর্টিকালচার-১২(২), পৃষ্ঠা নম্বর: ২৬৭-২৭১]*

চাষ ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু: ট্রপিক্যাল জলবায়ু এই ফল চাষের জন্য উত্তম। ড্রাগন ফল চাষ করতে কমপক্ষে ৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত ও ২০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

জাত: বর্তমানে বাংলাদেশে বাউড্রাগন ফল-১ (সাদা), বাউড্রাগন ফল-২ (লাল), বারি ড্রাগন ফল-১ ও বারি ড্রাগন ফল-২ জাতসমূহ চাষ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভিয়েতনামসহ অন্যান্য দেশ থেকে আনা কিছু জাতও চাষ করা হচ্ছে।

মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই ড্রাগন ফল চাষ করা যায়। তবে পানি জমে না এমন উঁচু ও উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে-দোঁয়াশ কিংবা এঁটেল দোআঁশ মাটিই এ-ফল চাষের উপযোগী। পাহাড়ী মাটিতেও এর চাষ করা যায়। মৃত্তিকা পিএইচ ৫.৫-৭.০ এরমধ্যে থাকলে ফলন ভাল পাওয়া যায়।

জমি প্রস্তুত: ড্রাগনের চারা রোপণের জন্য জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও আগাছা মুক্ত করতে হবে। চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পূর্বে প্রচুর জৈব সার যেমন ভার্মি কম্পোস্ট অথবা ট্রাইকো কম্পোস্ট সার যোগ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গর্ত তৈরি করতে হবে। একটি গর্ত হতে আরেক গর্তের দূরত্ব হবে ৮ ফুট। প্রতি গর্তে ৪০ কেজি পচা গোবর, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি ১০০ গ্রাম এবং জিপসাম, বোরাক্স ও জিংকসালফেট ১০ গ্রাম করে গর্তের মাটি উপরে-নিচে ভালোভাবে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

চারা তৈরি: কাটিং চারা থেকে বংশবৃদ্ধি করা যায়। চারা তৈরির জন্য প্রথমে ৬-৮ মাস বয়সী ১৫-১৮ ইঞ্চি লম্বা ডাল বাছাই করতে হবে। এরপর ধারালো ছুরি দিয়ে গাছ থেকে কেটে নিয়ে নিচের দিকের ২ ইঞ্চি পরিমাণ ছাল ছাড়িয়ে নিতে হবে যাতে কাস্টল অংশটুকু বেরিয়ে থাকে। মাথার দিকে ১-২ ইঞ্চি পরিমাণ সমান করে এমনভাবে কাটতে হবে যেন কাটিংটি ১২-১৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের হয়। কাটিংগুলিকে ১-২ দিন ছায়ায় রাখার পর আধোছায়া পরিবেশে হালকা বালিযুক্ত মাটিতে ৪৫ ডিগ্রি কোণে লাগিয়ে রাখলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে কুশি গজাবে এবং মূল জমিতে লাগানোর জন্য উপযুক্ত হবে। তবে কাটিং সরাসরি জমিতে লাগানো যায় অথবা পলিব্যাগেও চারা উৎপাদন করা যায়।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: বছরের যে-কোন সময়ই ড্রাগনের চারা লাগানো যায়। তবে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাস হলো উত্তম সময়। সারি থেকে সারি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব যথাক্রমে ৮ফুট × ৮ফুট । ৬০ সে.মি. × ৬০ সে.মি. × ৬০ সে.মি. আকারের গর্ত করে মাঝখানে একটি শক্ত খুঁটি বা পিলার স্থাপন করতে হবে। সর্বাধিক ফলন পাওয়ায় জন্য কাটিংকৃত কলম প্রতি গর্তে ৪টি করে লাগানো হয়। পিলারের চারদিকে কাটিংকৃত কলম চারা লাগিয়ে পিলারের সাথে বেঁধে দিতে হবে। ড্রাগন গাছ দেড় থেকে আড়াই মিটার লম্বা হয়। খুঁটির মাথার দিকে ছোট মোটর গাড়ির টায়ার সেট করতে হয়। এতে অতি সহজেই ড্রাগন গাছের শাখাগুলো ওপরের দিকে বৃদ্ধি পাবে। প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে দুশটি খুঁটি ও ৮০০ ড্রাগন ফলের চারা প্রয়োজন। তবে চারা রোপণ ও খুঁটি স্থাপণের পর কিছু পরিচর্যা করলে প্রতিটি গাছ হতে ২৫/৩০ বছর পর্যন্ত লাভজনকভাবে ফল সংগ্রহ করা যায়।

[তথ্যসূত্র: এমএম আলম পাটয়ারি, মো. সামছুল আলম (২০১৩), দুই জাতের ড্রাগন ফলের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, দ্যা অ্যাগরিকালচারিস্ট (অ্যা সাইন্টিফিক জার্নাল অফ কৃষি ফাউন্ডেশন) ১১(২), পৃষ্ঠা নম্বর: ৫২-৫৭ এবং এভিনোয়াম নার্ড, ইউসেফ মিজরাহী (২০১৩), শ্রীলঙ্কায় ড্রাগন ফলের চাষ, জার্নাল অফ দ্যা আমেরিকান সোসাইটি ফর হর্টিকালচার সাইন্স-১২(২), পৃষ্ঠা নম্বর: ৫৬০-৫৬২]

সাথী ফসল চাষ

ড্রাগন ফলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে থাই পেয়ারা ও বিভিন্ন শাক সবজির চাষ করা যায়। এতে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। সাথী ফসল হিসেবে রবি মৌসুমে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেয়াজ, রসুন, লালশাক, মূলা এবং খরিপ মৌসুমে ডাটা, পুইশাক, কলমিশাক ইত্যাদি চাষ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি খুঁটি থেকে একহাত দূরত্ব বজায় রেখে সাথী ফসল রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

ড্রাগন গাছে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ খাবার বায়ুমণ্ডল থেকেই সংগ্রহ করতে পারে এবং বাকি খাবার সংগ্রহ করে জৈব সার থেকে। মাটির উর্বরতা ও ধরনের ওপর সারের পরিমাণ নির্ভর করে। ড্রাগনের ফলন ও গাছের বৃদ্ধিতে জৈবসার মূখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতি গাছের জন্য গড়ে ১০ কেজি হারে জৈব সার প্রয়োজন। প্রতিবছর ২ কেজি হারে এই সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ফলধারণ অবস্থায় স্বল্পমাত্রায় নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম অধিক ফলন পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সাথে সাথে গাছের যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য জমিতে প্রয়োজন মাফিক রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি-১: বিভিন্ন বয়সের ড্রাগন গাছের সারের পরিমাণ

গাছের বয়স	খুঁটি/গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ/বছর			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয় (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩ বছর	৪০-৫০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৬ বছর	৫০-৬০	৩৫০	৩০০	৩০০
৬-৯ বছর	৬০-৭০	৪০০	৩৫০	৩৫০
১০ বছরের বেশি	৭০-৮০	৫০০	৫০০	৫০০

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা

ড্রাগন গাছ অনাবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার প্রতি খুবই সংবেদনশীল। অন্যান্য গাছের তুলনায় ড্রাগন ফলে কম সেচ প্রয়োজন হয়। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা-পর্যায়ে একবার, ফল ধারণপর্যায়ে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। পানির উত্তম ব্যবহারের জন্য ড্রিপ (Drip) সেচ প্রযুক্তি খুবই কার্যকরী। সাধারণত: শুষ্ক মৌসুমে প্রতিটি গাছের জন্য ১-২ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না-জমে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানিরকষ্ট দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই

ড্রাগন ফল চাষে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ তেমন হয় না। তবে গাছটি মিষ্টি হওয়ায় পিঁপড়ার আক্রমণ হয়। জৈব পদ্ধতিতে দমন করতে হলে বায়োমেক্স (এবামেকটিন) আর অজৈব পদ্ধতিতে দমন করতে হলে সেভিন/ফিনিস পাউডার ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। তাছাড়া গোড়াপঁচা ও আগাপঁচা এবং সানবার্ন দেখা যায়। গোড়াপঁচা ও আগাপঁচা জৈব পদ্ধতিতে দমন করতে হলে রিচার্জ (ট্রাইকোডার্মা) আর অজৈব পদ্ধতিতে দমন করতে হলে মেনকোজেব গ্রুপের যে কোন ঔষধ ব্যবহার করা যায়। তবে রিচার্জ (ট্রাইকোডার্মা) দ্বারা কাটিং শোধন করে নিলে এই রোগ সহজেই দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

ড্রাগন ফল গাছ সাধারণত ১২-১৮ মাস বয়স থেকেই ফল দেয়া শুরু করে। বছরে প্রায় সাত মাস ফল পাওয়া যায়, যা সাধারণত মে হতে নভেম্বর মাসে আহরণ করতে হয়। রোপণের প্রথম তিন বছর প্রতিটি খুঁটি হতে গড়ে ৩-৪ কেজি (প্রতি বিঘা হতে ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি) ফল পাওয়া যায়। গাছের বয়স ০৩ বছরের বেশি হলে প্রতিটি খুঁটি হতে গড়ে ১০ থেকে ১২ কেজি (প্রতি বিঘা হতে ১.৫ থেকে ২.০০ টন) ফল উৎপাদন করা যায়। আমাদের দেশে ড্রাগন ফল গাছে এপ্রিল মাসে ফুল আসা শুরু হয় এবং মে-নভেম্বর সময়ে ফল সংগ্রহ করা হয়। ড্রাগন গাছে ফুল আসার ৩০-৫০ দিনের মধ্যে প্রতিটি ফল পরিপূর্ণতা লাভ করে। অপরিপক্ক ফল উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হয় আর পরিপক্ক ফল যখন সম্পূর্ণ লাল রং ধারণ করে। রং পরিবর্তনের ৩-৪ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা উত্তম। রপ্তানির জন্য রং পরিবর্তনের ৩-৪ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করতে হবে। কাঁচি দিয়ে ফলের গোড়া কেটে ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল সংগ্রহের সময় হাতে গ্লাভস ব্যবহার করলে ফলের গুণগত মান বজায় থাকে। ড্রাগন ফল পাকা অবস্থায় গাছে ৫-৭ দিন রেখে দেওয়া যায়। আর ফল সংগ্রহ করে প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায়। প্রয়োজনীয় পরিচর্যায় একটি ড্রাগন বাগান ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত ফল উৎপাদন করতে পারে।

বাজার বিশ্লেষণ

ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ড্রাগন ফলের চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও ইউরোপ ও আমেরিকান দেশসমূহে দিন দিন এ ফলের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিরও সমূহ সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে প্রতি কেজি ড্রাগনের বাজার মূল্য ৩০০-৫০০ টাকা। তবে দেশের উদ্যান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে ড্রাগনের দাম অনেকাংশে হ্রাস পাবে। উপযুক্ত যত্ন নিলে একর প্রতি ড্রাগনের বার্ষিক উৎপাদন হয় ৬-৭ টন। কেজিপ্রতি ন্যূনতম মূল্য ২০০ টাকা ধরলে মোট মূল্য হবে ১২-১৪ লক্ষ টাকা। প্রতি একরে সার্বিক খরচ ৬-৭ লাখ টাকা বাদ দেওয়ার পরও নীট মুনাফা থাকবে ৬-৭ লক্ষ টাকা।

বিদ্যমান সমস্যা...

ড্রাগন ফল চাষে আমাদের দেশের ইতিবাচক পরিবেশ পরিস্থিতি রয়েছে। এটি উত্তম-মাত্রার পুষ্টি ও ঔষধি গুণ-সমৃদ্ধ একটি বিশেষ ফল। অন্যদিকে বাজার মূল্যও সর্বাধিক। এরপরেও এই ফলটি এখন পর্যন্ত অন্যান্য ফলের তুলনায় বাজার দখলে পিছিয়ে রয়েছে। কেন এই অনাগ্রহতা, তা অনুসন্ধানে এসএসএস কৃষি বিশেষজ্ঞ, চাষি ও ভোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছে।

এসএসএস অনানুষ্ঠানিকভাবে একটি পর্যবেক্ষণমূল অনুসন্ধান পরিচালনা করেছে। এই পর্যবেক্ষণ হতে দেখা যায়--আমাদের দেশে এই ফলটি নতুন হওয়ায় চাষি ও ক্রেতাগণ এর সম্পর্কে অনেককিছু জানে না। বিশেষ করে চাষিগণ ড্রাগনের চাষ পদ্ধতি ও পরিচর্যা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ।

অপরদিকে এই বাগান করতে শুরুতেই ৮০-৯০ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত লোকসানের ভয়ে সাধারণ কৃষকগণ ড্রাগন চাষে আগ্রহী নন। কেন-না স্থানীয় ক্রেতাগণ এর পুষ্টি ও ঔষধি গুণ সম্পর্কে তত-একটা অবগত নন। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য ফলের তুলনায় উচ্চ বাজার মূল্য, যার জন্য অনেকের আগ্রহ থাকলেও তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যায়। অনেকে অজ্ঞতার কারণে ভয়ে এই ফল খায় না।

সমাধানের উপায়...

উপর্যুক্ত সমস্যা দূরীকরণে কিছু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- প্রতিটি উপজেলায় কৃষি অধিদপ্তরকে সবার প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে।
- কৃষির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।
- প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে দুটি করে ড্রাগন চাষের প্রদর্শনী খামার স্থাপন করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষকদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, দূর করতে হবে জ্ঞানগত সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা।
- সর্বোপরি ড্রাগন ফলের পুষ্টি ও ঔষধি গুণ জনসাধারণের নিকট তুলে ধরতে হবে। এরজন্য প্রতিটি অঞ্চলে কর্মশালা ও আলোচনা সভা করতে হবে। ক্রেতা-ভোক্তাদের জ্ঞানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে এর চাহিদা সৃষ্টি হবে।

প্রয়োজনীয় যোগাযোগ

এসএসএস ফাউন্ডেশন অফিস

এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল

ফোন: ০৯২১-৬৩১৯৫, ০১৭৩০-০১১৪৫২

ই-মেইল: ssstgl@yahoo.com

Website: www.sss-bangladesh.org